হোমিও ঔষধে টিউমার নিরাময়

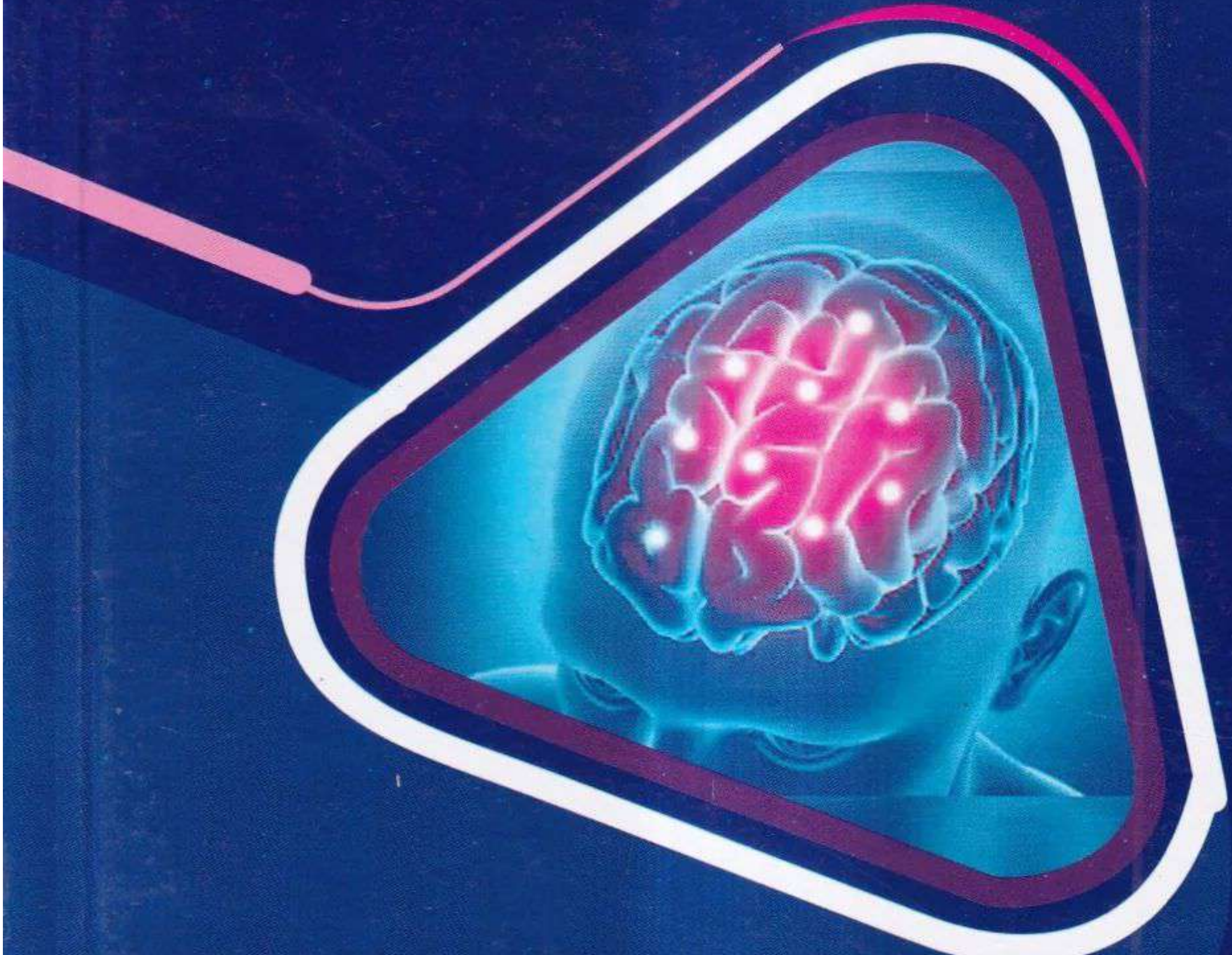

বারনেট

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

১। মুখবন্ধ...1
২। চিকিৎসার রীতি পদ্ধতি প্রসঙ্গে প্রাথমিক মন্তব্য..............................4
৩। ক্রিয়ার প্রকারভেদ...6
৪। ক্রিয়ার ব্যাপ্তি..7
৫। ক্রিয়ার থেমে পড়া অবস্থান বিন্দু...8
৬। পরিচ্ছেদ—১: ওষুধে অর্বুদ নিরাময়......................................12
৭। বুকের অর্বুদরোগের ওষুধে নিরাময়ের একটি বৃত্তান্ত। (১)......................14
৮। ওষুধ দিয়ে বুকের অর্বুদ নিরাময়ের একটি বিবরণ। (২).........................16
৯। বাধাবিঘ্ন..19
১০। হোমিওপ্যাথি অর্বুদ সারানোর কতটা উপযুক্ত..................................21
১১। দুর্ঘটনার পরিচ্ছেদ— হাড়ের অর্বুদ..23
১২। ঘোড়ার হাড় ভাঙার চিকিৎসা..25
১৩। অস্থিতন্তু অর্বুদ..27
১৪। অস্থিতন্তুর অর্বুদের প্রকৃতি সম্বন্ধে ডাঃ গ্রভ্‌লের তত্ত্ব..........................27
১৫। অস্থিতন্তুর অর্বুদ(পরবর্তী অংশ) খড়ের জলে স্নান.............................28
১৬। আঘাত জনিত অর্বুদ ও তার নিরাময়(অরগ্যানোপ্যাথী)..........................31
১৭। অনেক সময় একটার বেশি ওষুধের প্রয়োজন হয়...............................35
১৮। গলার অর্বুদ...35
১৯। হোমিও নিদান তত্ত্ব— দাড়ির ক্ষত, মুখের আঁচিল জাতীয় অর্বুদ....................38
২০। জন হান্টারের নিরাময় ধারণা...39
২১। প্লাটিনাম প্রয়োগে চোখের পাতার মাংস পিন্ড নিরাময়..............................41
২২। ডিম্বকোষের অর্বুদ (১)..42
২৩। তলপেটের অর্বুদ..43
২৪। জরায়ু এলাকার অর্বুদ..44
২৫। বাঁ ডিম্বকোষের অর্বুদ (২)...46
২৬। জরায়ুতে আঁশবহুল (তন্তুজ)অর্বুদ (স্ফীতি)...................................51
২৭। ডিম্বকোষের অর্বুদ (৩)..53
২৮। লক্ষন অনুযায়ী ওষুধ দিয়ে অর্বুদ নিরাময়....................................56
২৯। 'কলোসিন্থ' দিয়ে ডিম্বকোষের অর্বুদ নিরাময়ের ঘটনা...........................56
৩০। পেটের মধ্যে বড় তন্তুজ অর্বুদের ঘটনা......................................58
৩১। ডানদিকের বুকের অর্বুদ..61
৩২। চিকিৎসককে সৈন্যাধক্ষ হতেই হবে (নিরাময় যুদ্ধের কলাকৌশল)..................63
৩৩। অরগ্যানোপ্যাথি হোমিওতে আবদ্ধ...65

৩৪। পেটের বাঁদিকের কোঁকে অর্বুদ 69
৩৫। তলপেটের অর্বুদ (২)....................................72
৩৬। কর্কটগ্রস্ত জিবের অর্বুদ 75
৩৭। মাথার পেছনে লসিকাজাত অর্বুদ....................................75
৩৮। মাথার চাঁদিতে চর্বিময় অর্বুদ 76
৩৯। স্তনের অর্বুদ (১)....................................77
৪০। চোখের কোনে সংবহন লসিকা বৃদ্ধি....................................79
৪১। ডিম্বকোষে অর্বুদ— বিবাহে তার প্রভাব 80
৪২। স্তনের অর্বুদ চিকিৎসা— বিবাহে তার প্রভাব 82
৪৩। বাম স্তনের অর্বুদ (২) 82
৪৪। একটা কাজে বিভ্রান্তিকর ফলাফল 83
৪৫। বাঁদিকের পাছার অর্বুদ 83
৪৬। বাঁ স্তনের অর্বুদ নিরাময় (৩) 84
৪৭। অণ্ডকোষের অর্বুদ....................................86
৪৮। লিঙ্গ মুণ্ডের ছোট অর্বুদ....................................87
৪৯। বুকের ও ঘাড়ের অনাল গ্রন্থির স্ফীতি....................................88
৫০। বাঁ স্তনের ছোট অর্বুদ—ঘাড়ের লসিকা গ্রন্থি অর্বুদ....................................89
৫১। কর্কট রোগে অস্ত্রোপচারের পর 90
৫২। লিঙ্গের ছোট অর্বুদ 92
৫৩। লিঙ্গের অস্থিজাত অর্বুদ 92
৫৪। মুখের জড়ুল (Keliod) 94
৫৫। দুটি অর্বুদ....................................95
৫৬। যোনির কাছে (উরুতে) চর্বির অর্বুদ 96
৫৭। ছোট চর্বিপিণ্ড—থুজায় নিরাময়....................................97
৫৮। একটি ডিম্বকোষের অর্বুদের চিকিৎসা (৪)....................................98
৫৯। ডানদিকের ডিম্বকোষের অর্বুদ (৫) 99
৬০। ডিম্বকোষের অর্বুদ (৬)....................................100
৬১। ডিম্বকোষের অর্বুদের বিবরণ (৭) 101
৬২। ডিম্বকোষের অর্বুদের ঘটনা (৮)....................................102
৬৩। সাঙ্গুই মুগার ব্যাপার কিছু তথ্য....................................103
৬৪। স্তনের শক্ত অর্বুদ....................................104
৬৫। সংবহন নালিকায় জন্মগত অর্বুদ 105

ওষুধে টিউমার নিরাময়

চিকিৎসার রীতিপদ্ধতি প্রসঙ্গে প্রাথমিক মন্তব্য

ওষুধের প্রতিক্রিয়া যখন আমাদের অর্থনীতির বিশেষ কোনো অংশকে আঘাত করে, তখন সাধারণ ভাবে ঠিক কী ঘটে, তা বহু নিন্দিত মহামতি প্যারাসেল্সাস বিস্তৃতভাবে বলেছেন এবং ঐটিই তাঁর চিকিৎসা পদ্ধতির মেরুদণ্ড হয়ে রয়েছে।

তাঁর 'উপযোগী-বাদ' এর মূল কথাই হচ্ছে এই ধরনের ওষুধ-বিষুধ। অর্থাৎ শরীরের জৈব অংশে বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ওপরে যেমন-যেমন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়-সে সবের ওপরেই এই পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যে নির্ভর করে। যেমন, ধরা যাক, বৃক্ক বা মূত্রগ্রন্থি রক্তের কোনো-কোনো অংশকে ধরে নিয়ে যাকে বলে, মূত্রে পরিণত করে। এই সূত্রকে ভিত্তি করে প্যারাসেসাসের চিকিৎসা পদ্ধতি তাঁর সময়ের সাধারণ চিকিৎসা পদ্ধতির চেয়েই শুধু নয়, এখনকার দিনের গোঁড়া চিকিৎসাপদ্ধতির চেয়েও অনেক বেশি প্রগতিশীল।

কেউ যদি এই বিবৃতির ওপরে প্রশ্ন তুলতে চান, তাইলে তিনি যেন, ধরা যাক, মূত্র পাথুরি সম্বন্ধে প্যারাসেল্সাসের চিকিৎসা পদ্ধতির সঙ্গে সবচেয়ে পুরোনো চিকিৎসার সুপারিশের সঙ্গে তুলনা করে দেখে নেন (এ-ব্যাপারে ভালোটিকে গ্রহণ করার মত ঔদার্য যাঁদের আছে, তাঁদের বাদ দিচ্ছি-কারণ তাঁরা প্রকৃতই জৈব অঙ্গবাদী এঁরা প্রায়শই খুবই নির্ভরযোগ্য চিকিৎসক)।

এই শতকের (১৯ শতক) প্রথম দিকে রেড্ম্যাচার 'মেডিসিনা প্যারাসেল্সিকা' পদ্ধতিকে নতুন করে আবিষ্কার করলেন এবং বহুদিন সাফল্যের সঙ্গে চিকিৎসা চালিয়ে এর পদ্ধতি-প্রকরণ সম্বন্ধে এমন জোরের সঙ্গে শেখালেন যে তার ফলে চিকিৎসা জগতে একটা নতুন শিক্ষাপদ্ধতির সৃষ্টি হলো এবং তাঁর শিষ্যরা তাঁর শ্রদ্ধেয় নাম গ্রহণ করে নিজেদের রেড্ম্যাচরিয়ানস বলে পরিচয় দিলেন। ফলে, এর থেকে সাধারণভাবে অঙ্গ চিকিৎসা, অঙ্গরোগ তথা অঙ্গচিকিৎসা পদ্ধতি (Organopathy) ইত্যাদি শব্দগুলির প্রচলন হলো।

হ্যানিম্যান্ তাঁর হোমিওপ্যাথি আর রেড্ম্যাচার তাঁর অঙ্গ চিকিৎসা (আসলে প্যারাসেল্সিকার নতুন করে আবিষ্কার) আবিষ্কার করলেন প্রায় একই সময়ে এবং বলা যায় যে, উনিশ শতকের চারের দশকেই এই দুটি পদ্ধতিই (একই সঙ্গে) পূর্ণতা পেলো।

অর্থাৎ হ্যানিম্যান পদ্ধতির চিকিৎসা (হোমিওপ্যাথি) আর প্যারাসেল্সিকা বা উপযোগী চিকিৎসা কার্যতঃ (কখনো কখনো একে রেড্ম্যাচারানিয়াসম্ও বলা হয়) সমসাময়িক।

হ্যানিম্যানের ওষুধ পবিত্র অবস্থায় বিশুদ্ধ ভেষজের গতিশক্তির ওপরে প্রতিষ্ঠিত—এটি আসলে ভেষজের শক্তিকে চিকিৎসায় প্রয়োগ করার ব্যাপারে প্রথম এবং মূল কাজ হচ্ছে দেহের অঙ্গে, ইন্দ্রিয়ে ভেষজজাত ওষুধের প্রতিক্রিয়া থেকে স্বয়ং নির্ধারিত। সুতরাং এই অবস্থা পর্যন্ত প্যারাসেল্সিক্ ওষুধ আর হ্যানিম্যানের ওষুধ একই রকমের।

কিন্তু প্যারাসেল্সিক্ পদ্ধতি (অরগ্যানোপ্যাথি) মূলতঃ রুগ্ন মানুষের ওপরে ওষুধ

প্রয়োগ করে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া দেখে তার ওপরেই গড়ে উঠেছে, পুরোনো হ্যানিম্যানপন্থীরাও প্রথমদিকে বাইরের আর ভেতরের লক্ষণাবলী দেখার এই পদ্ধতিকে গ্রহণ করেছিলেন। অন্যদিকে হ্যানিম্যানের ওষুধ (হোমিওপ্যাথি) সুস্থ, স্বাস্থ্যবান মানুষের উপরে প্রয়োগ করে ওষুধের ক্রিয়ার ফল থেকে (ওষুধ প্রমাণ-পরীক্ষা) গড়ে উঠেছে। যাইহোক পুরোনো ওষুধের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিও প্যারাসেল্সিক ওষুধের মতই—একই রকমের।

এটিই হচ্ছে আমার মত আর এই মতকে মন্তব্যকে প্রমাণ করতে আমি প্রস্তুত।

এইভাবে কিছুদিন চলার পর অরগ্যানোপ্যাথির চিকিৎসকরা হ্যানিম্যানের ওষুধ পরীক্ষা কে গ্রহণ করলেন, এবং তা করে তাঁরা বড় মাত্রার হোমিওপ্যাথই হয়ে গেলেন।

কারণ রেড্ম্যাচারিয়ানরা (অরগ্যানোপ্যাথরা) যখন থেকে ওষুধ পরীক্ষা করতে শুরু করলেন তখন থেকেই তাঁরা প্রায় হোমিওপ্যাথ্দের সমান পথের পথিক হয়ে গেলেন যাঁরা কিনা কমমাত্রার ওষুধই দিতেন। সম-সমতার তত্ত্ব স্বীকারের ব্যাপারেই শুধু তাঁদের আলাদা করে রাখলো।

ঐ অবস্থার সময়ে এখন করে রিংগারপন্থীদের মতই অরগ্যানোপ্যাথ্রা হোমিও প্রভাবিত ছিলেন। আর রেড্ম্যাচরিয়ানরা যতোই ওষুধ পরীক্ষা করতে লাগলেন ততই হোমিও প্রভাবিত হতে থাকলেন—এইভাবে চলতে চলতে একদিন তাঁদের পৃথক সত্তা ক্ষীণ হতে হতে লোপ পেয়ে গেলো—তাঁরা অজ্ঞাতসারে নিজেদেরকে হোমিওপ্যাথির লেজুড় করে ফেললেন। হোমিওপ্যাথি যে অরগ্যানোপ্যাথিকে গ্রাস করে ফেলল তার কারণ হচ্ছে যে হোমিওপ্যাথি হচ্ছে অরগ্যানোপ্যাথি এবং আরো কিছু অর্থাৎ সমতাতত্ত্বের প্রভেদ বিশ্লেষণ।

হ্যানিম্যানের ওষুধ যদি প্রমাণিত বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার ওপরে প্রতিষ্ঠিত না হতো তাহলে বহুদিন আগেই তা বিলুপ্ত হয়ে যেতো শুধু ঐতিহাসিক উপলব্ধির প্রকাশের ঘটনা হিসেবেই তার স্থান হতো। কিন্তু এই তত্ত্ব বেশ ভালোভাবেই টিকে আছে। আপনি লক্ষণবাদী, স্বাতন্ত্র্যবাদী কিংবা বাছ-বিচারবাদী হোন, কিংবা এ্যালোপ্যাথ, যেই হোন না কেন একে হটাতে পারবেন না।

বিশেষ মাত্রার আফিম যে কোষ্ঠবদ্ধতা ঘটায় তা প্রমাণিত স্বীকৃত। আবার সূক্ষ্মমাত্রার আফিম যে কোষ্ঠ সাফ করে তাও প্রমাণিত এবং স্বীকৃত।

আফিম যে ধরনের কোষ্ঠবদ্ধতা ঘটায় আর যে ধরনের কোষ্ঠসাফ করে তা একই রকমের এবং তা প্রমাণিত এবং স্বীকৃত।

আফিম সম্বন্ধে এখানে যা বলা হলো তা পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে, পরীক্ষা করে দেখাও হয়েছে, এবং শেষ অবস্থা পর্যন্ত যোগ্যলোকের দ্বারাই তা করা হয়েছে—তাই তাকে স্বীকৃতিও দেয়া হয়েছে।

এখন অরগ্যানোপ্যাথ, এবং বড়মাত্রার গুণাগুণ পরীক্ষাপন্থী হোমিওপ্যাথ্রা তত্ত্বগতভাবে এবং কার্যতঃ মিলেমিশে গেলো তাই এবার আমাদের কাজের দ্বিতীয় সূত্রের দিকে এগিয়ে যাবো।

ক্রিয়ার প্রকারভেদ

যদি আমরা স্বীকার করি যে, কোনো কোনো ওষুধ সত্যিই কোনো বিশেষ অঙ্গ বা তার অংশকে প্রভাবিত করে তাহলে, আমাদের মনে প্রশ্ন উঠবেই—কেমন করে? কোন গুণে অমনটা হয়? এইখানেই আমরা বেশ জটিল অসুবিধের মুখোমুখি হই।

সবকিছু বিবেচনা করে দেখলে বোঝা যায় যে, একটা ওষুধ যে উপসর্গের সৃষ্টি করল সেই উপসর্গটার মধ্যে থেকেই এর উত্তরটার বেশিরভাগই পাওয়া যাবে।

এইভাবেই, নিউমোনিয়া ও যক্ষ্মা রোগে দেখা যায় যে ফুসফুস থেকে রক্ত বেরুচ্ছে, আর অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানি যে, ঐ রোগে ফুসফুসে প্রদাহ জনিত ক্ষত বা বিকৃতি ঘটে, সঙ্গে সেখান থেকে রক্ত উছলে বেরিয়ে আসে। এখন আমরা যদি ফুসফুসের ওপরে 'ফস্‌ফরাস্' এর প্রতিক্রিয়াটাকে পরীক্ষা করে দেখি তাহলে দেখতে পারো যে ঐ ওষুধটাও ফুসফুসে ক্ষয়কাশ বা নিউমোনিয়ার মতন কোনো-কোনো ধরনের বিকৃতি ঘটায়।

একজন অরগ্যানোপ্যাথ্ হয়তো বলবেন: হ্যাঁ, নিউমোনিয়া অবশ্যই ফুসফুসের রোগ, কিংবা বলা যায় যে, ফুসফুসেই এর প্রকাশ ঘটে *(*এখনকার প্রয়োজনে এবং পার্শ্ব-প্রসঙ্গ এড়িয়ে যাবার জন্যে রেমিডিয়া ইউনিভার্সালিয়া কে এর মধ্যে জড়াচ্ছি না) কিন্তু যতক্ষণ না চিকিৎসা-শাস্ত্রমতে পরীক্ষা করছি, ততক্ষণ ফুসফুসের ঐ অবস্থার জন্যে কোন ওষুধ দেবো বলতে পারছি না।

কিন্তু হোমিওপ্যাথ বলবেন আঃ! না, তা মোটেই নয়। না, তা মোটেই নয়। আমরা সূক্ষ্ম-বিজ্ঞান সম্মতভাবে আগেই নিখুঁতভাবে বলে দিতে পারি তোমার ফুসফুসের রোগে কোন ওষুধ দেয়া উচিত। কেমন করে? রোগের লক্ষণের সঙ্গে ওষুধের লক্ষনের তুলনা করে, এবং যে ওষুধ লক্ষণগতভাবে রোগলক্ষণের রোগের প্রকোপের সবচেয়ে কাছাকাছি জায়গায় মিলে যাবে সেই ওষুধই ঐ রোগকে অবশ্যই সারিয়ে দেবে। ফস্‌ফরাস্ দ্বারা প্রভাবিত সমতা দেখা যায়, সুতরাং তত্ত্বের দিক দিয়ে এবং বাস্তবেও সমান। চিকিৎসা করতে গিয়ে এর যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে এবং বইপত্রেও এর প্রচুর উদাহরণ পাওয়া যায়।

আমি নিউমোনিয়া ও যক্ষ্মা রোগে বহুবার ব্যবহার করে খুব ভালো ফল পেয়েছি, আরো হাজারবারও পাবো। যাঁরা ফসফরাসের এই ক্ষমতার কথা অস্বীকার করেন (আমি অবশ্য শুদ্ধমুক্ত ফস্‌ফরাসের কথা বলছি) তাঁরা ফসফরাসকে বাদ দিয়ে আরোগ্য করে যদি দেখাতে পারেন তাহলে তাঁদের অস্বীকার করার কিছু মূল্য আছে, একথা মেনে নিতে আমি রাজী আছি, শুধু কথায় চলবে না।

তাহলে এখন আমরা যে জায়গায় পৌঁছলাম তা হচ্ছে, ওষুধ ও রোগ শুধুমাত্র কোনো অঙ্গকে একই ভাবে প্রভাবিত করলেই হবে না—ওষুধের লক্ষণের সঙ্গে রোগের লক্ষণের পরস্পরের একই রকমের মিল হওয়া চাই। একেই বলে একরকমের ক্রিয়া বা প্রতিক্রিয়া। রোগের মাত্রার আর ক্রিয়ার প্রকারও মাত্রার তফাৎ হতে

পারে, মাত্রা ব্যাপকও হতে পারে, কিন্তু এখানে আমাদের বিবেচনার বিষয় হচ্ছে নিম্নোক্ত প্রাথমিক ব্যাপারগুলোকে পরীক্ষা করে দেখানো—

প্রথম—রোগের ক্রিয়ার অবস্থা। দ্বিতীয়—ক্রিয়ার প্রকার ও চরিত্র।

ক্রিয়ার ব্যাপ্তিতে

একজন সুস্থ মানুষের যদি ঠাণ্ডা লেগে নিউমোনিয়া হয়, তাহলে তার চিকিৎসার জন্যে অসুখের কারণটা তখন আর নেই, কারণ ঠাণ্ডা যা করার তা করে দিয়ে গেছে, ফলটা আছে আর ফুসফুসে বাসা বেঁধেছে। নিঃশ্বাসের কষ্ট, কাশি, রক্ত-শ্লেষ্মা ইত্যাদি। 'অ'-থেকে 'চন্দ্রবিন্দু' পর্যন্ত ঐগুলিই রোগ। ফস্ফরাস সেবন করালে ঐ ঠাণ্ডা লাগার নিউমোনিয়া সারবে, ঐখানেই ওর কাজ শেষ, রোগী ভালো হয়ে উঠবে, খারাপ কিছু হবেনা।

কিন্তু যদি কোনো বাইরের জিনিস ধরা যাক, একটা ছোট্ট পেরেক ফুসফুসে ঢুকে গিয়ে নিউমোনিয়া বাধালো—শ্বাসকষ্ট, কাশি, রক্তশ্লেষ্মা ইত্যাদি কষ্ট হতে লাগল, এখানে অসুখের কারণ হলো ঐ ছোট্ট পেরেকটি। এ-ক্ষেত্রে ফস্ফরাস প্রয়োগ করলে প্রথম-প্রথম ঠাণ্ডা লাগা নিউমোনিয়ার মনে হবে। কিন্তু কিছুটা সারার দিকে গিয়ে থেমে যাবে, তারপর খারাপের দিকে পেছুবে, ঝামেলা পাকাবে।

ফস্ফরাস নিউমোনিয়ার হোমিওপ্যাথি ওষুধ ঠিকই কিন্তু পেরেকের নয়। ঐ পেরেকজাতীয় বিশেষ জিনিসটি রোগটাকে সারতে তো দিচ্ছেই না বরং আরো উপসর্গ সৃষ্টি করছে—যেমন, হৃৎপিণ্ডকে দুর্বল করছে, ওখানকার রক্তকোষের কপাটের বিকৃতি ঘটাচ্ছে, জীবাণুর জন্ম দিচ্ছে এইসব।

ধরা যাক ঐ সব সক্রিয় জীবাণু থেকে আবার নিউমোনিয়া হলো তখনো পেরেকজাত নিউমোনিয়ার মতই ফস্ফরাস কাজ করবে—কিন্তু পেরেকটা থেকে মুক্তি দিতে পারবে না, আর পেরেকজাত জীবাণুগুলোর থেকেও নয়।

এই ব্যাপারটা থেকে বোঝা গেলো যে, শুধুমাত্র নির্ভরযোগ্য রোগনির্ণয়কারীর কাছ থেকেই সঠিক, বিজ্ঞান সম্মত হোমিও-চিকিৎসা পরামর্শপত্র পাওয়া সম্ভব। শুধু লক্ষণ-উপসর্গের সমতা নেওয়াটাই যথেষ্ট নয়। হোমিও দৃষ্টিভঙ্গী, সদিচ্ছা, মনোযোগ ও পরীক্ষাজাত অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে হবে।

অর্থাৎ ক্রিয়া বা প্রতিক্রিয়ার ব্যাপ্তি বা সীমাটাকে এক প্রান্ত থেকে অন্যদিকের শেষ পর্যন্ত বিস্তৃত করে হোমিওদর্শন অনুযায়ী দেখতে হবে এবং তাকে বহুদূর পর্যন্ত নিয়ে যেতে হবে যেমন পেরেকজাত নিউমোনিয়া থেকে পেরেক পর্যন্ত কিংবা জীবাণুমত নিউমোনিয়া থেকে জীবাণু পর্যন্ত :—লক্ষ্য করতে হবে (১) ক্রিয়া কোথায় সক্রিয় (২) সক্রিয়তার ধরণধারণ এবং এর সঙ্গে যোগ করেছি (৩) নিরাময়যোগ্য ওষুধের ক্রিয়ার সীমানা কতদূর পর্যন্ত।

এটা খুব বেদনার কথা যে, এই বিজ্ঞানমনস্ক যুগেও সবচেয়েযোগ্য এবং উচ্চশিক্ষিত ভেষজবিদ এবং রোগবিদ্যাবিদরা বিজ্ঞান সম্মত হোমিওতত্ত্ব বা ফলিতজ্ঞানের শিক্ষা দিচ্ছেন না। সম্মান ও অর্থ দিয়েও তাঁদের পাওয়া যাচ্ছে না। হোমিওপ্যাথি মোটেই

শেখানো হচ্ছে না। কেন হচ্ছে না? কারণ সাধারণ চিকিৎসা-সংগঠন কর্তারা এটা বোঝেন না, এবং তাঁরা যেটা জানেন না সেটাকে জ্ঞান বলে মনে করেন না। মনে হয়, মাঝে মধ্যে কেউ-কেউ এই বিদ্যার এটা-সেটার প্রান্তভাগটাকে পরখ করে দেখেন মাত্র, তারপরেই কেমন যেন পিছিয়ে যান তাঁদের কাছ থেকে আর কিছু শোনা যায় না। এটাই চিকিৎসা জগতের যাজক সম্প্রদায়ের অভিশাপ।

এবারে যে-বিষয়ের দিকে যাবো তার নাম—

ক্রিয়ার থেমে পড়ার অবস্থান বিন্দু

কোনো একটা ওষুধের ক্রিয়া যদি একটা অবস্থা পর্যন্ত গিয়ে অকেজো হয়ে যায়, আর এগোতে না পারে, তখন সেই অবস্থাটা হলো ক্রিয়ার থেমে পড়ার অবস্থান-বিন্দু।

এইভাবে পেরেকজাত নিউমোনিয়ায় ফস্‌ফরাস দিয়ে চিকিৎসা ওষুধের ক্রিয়া ঐ পেরেক পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়ে গিয়ে থেমে যাবে, ঐ পেরেকটাই ওষুধের ক্রিয়ার থেমে পড়ার অবস্থান-বিন্দু। জীবাণুজাত নিউমোনিয়ায় যেখানে জীবাণু সক্রিয় সেখানেই ওষুধে অকেজো হওয়ার অবস্থান বিন্দু। তাহলে, আমাদের কোনো ওষুধের সক্রিয়তার সীমার কথা বিবেচনা করে দেখতে হবে যে, ওষুধ রোজের সক্রিয়তার সঙ্গে সহ-অবস্থান করতে করতে গোফা থেকে শেষ পর্যন্ত যায় কিং একটা বিশেষ জায়গা পর্যন্ত যায়, যদি একটা অংশ পর্যন্ত গিয়ে থেমে যায়, তাহলে সেটাই তার থেমে যাওয়ার অবস্থান-বিন্দু, সেখানে তার ক্রিয়া বন্ধ হয় বা ক্রিয়াখরচ হয়ে যায়।

এই বিবেচনাটা খুবই দরকারী কারণ কোনো ওষুধ প্রয়োগ করে তার অকেজো অবস্থানের সীমাটাকে জানতে পারলে আমরা ছদ্ম আরোগ্যের তুষ ঝেড়ে ফেলে আসল আরোগ্যের গমকে বেছে নিতে পারবো।

একটা রোগ তার লক্ষণের মধ্যেই সবকিছু প্রকাশ করে বলে যে ধারণা আছে তাতে আমার সায় নেই কারণ তা সত্যি নয়। তা হতেও পারে আবার নাও হতে পারে। উপসর্গ লক্ষণের মধ্যে সব কিছু আছে ভেবে নেয়া যথেষ্ট নয়। এটি ভেবে আরম্ভ করা মানে অর্ধেক পক্ষ যাওয়া তখন আমাদের প্রশ্ন করতে হবে—এই রোজের প্রকৃত চরিত্রটা কি? স্বাভাবিক ইতিহাসটা কি? রোগ-বিকার তত্ত্বটিই বা কি? কোন ব্যাপার রোগটিকে ঘটিয়েছে? সেই কারণটা এখনো আছে না চলে গেছে? যে ওষুধটাকে বাছা হচ্ছে সেটা ঐ ধরনের প্রকৃত রোগ সৃষ্টি করতে পারে কিনা? আসলে ওষুধটা অকেজো অবস্থাটাকে ডিঙ্গিয়ে সমানে সক্রিয় অবস্থায় যাবার মত প্রকৃতি হোমিওপ্যাথিক কিনা? যদি তা না হয় তাহলে আমরা ভুল গন্ধকে অনুসরণ করছি, রোগীকে একটু ভালো রাখতে নয়, তাকে সারিয়ে তুলতে যদি চাই, তাহলে, এসব ভাবতেই হবে। একবার আমি বেশ কিছুদিন ধরে একটি তরুণীর চিকিৎসা করেছিলাম, মেয়েটির বারেবারেই মস্তিষ্কের অবরোধ ঘটতো, তখন সারাশরীর লাল আর গরম হয়ে উঠতো, চোখের মণি বড় হয়ে উঠতো, অস্থির অবস্থায় সে বিছানায় ওলট-পালট খেতো আর আবোল-তাবোল

বকতো। দেখে মনে হয়েছিল ওটি বেলেডোনা বিষের রোগের সুন্দর ছবি। তাই তাকে প্রতিবারই বেলেডোনা দেয়া হতো আর সে ভালো হয়ে উঠতো। শেষে একবার বেলেডোনা ব্যর্থ হলো এবং মেয়েটি মারা গেলো। মারা যাওয়ার পর বোঝা গেলো যে, ওর বারবার একই ধরনের আক্রান্ত হবার কারণ হলো, মাথার মধ্যে যক্ষ্মা গুটিকা। মারা যাবার পর ব্যাপারটা পরিষ্কার হলো। বেলেডোনা প্রতিবারেই লক্ষণগুলোকে সারাচ্ছে কিন্তু রোগটা ভেতরে অটুট থেকে যাচ্ছে, ফলে মেয়েটি ওতেই শেষকালে মারা গেলো। এই রোগিনীর ব্যাপারে বেলেডোনা ওষুধটা যক্ষ্মাগুটিকার আগে পর্যন্ত সক্রিয় থেকে কমিয়ে দিচ্ছিল, তারপরে আর পারছিল না। যে পর্যন্ত বেলেডোনা সক্রিয় ঠিক তার শেষ বিন্দুটাই থেমে যাওয়া অবস্থান বিন্দু। তারপরে নয়। কিন্তু কেন? কারণ ঐ থেমে যাওয়া বিন্দুর পরে হোমিওপ্যাথি পৌঁছতে পারছিল না। শুরু থেকে ঐ পর্যন্ত হোমিওপ্যাথি পুরোমাত্রায় সারাবার মত সক্রিয় শক্তি, কিন্তু তারপর থেকে পূর্ণ আরোগ্যলাভ করা পর্যন্ত ওষুধটি অকেজো, কারণ ওষুধটা হোমিওপ্যাথি সম্মত হয়নি। কারণ আমরা জানি বেলেডোনা যক্ষ্মার মত নিষ্ক্রিয় গুটিকা সৃষ্টি করতে পারে না। বহুবার এই পরম সত্যের সামনে পৌঁছতে পেরে আমি সন্তুষ্ট হয়েছি।

তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি কোনো ওষুধে যদি কোনো রোগকে সারাতে হয় তাহলে ওষুধটিকে রোগের বিভিন্ন অবস্থার সঙ্গে সমানে সক্রিয় থাকতে হবে, একই রকমের প্রতিক্রিয়া ঘটিয়ে যেতে হবে, তাছাড়া রোগের সক্রিয়তার সঙ্গে ওষুধের সক্রিয়তাকে সমান তালে তাল নিয়ে যেতে হবে।

যক্ষ্মা গুটিকার, বিশেষ করে মস্তিষ্কের চিকিৎসায় আমি কখনো-সখনো গ্লোনয়িন ৩x এবং আইয়োডিয়াম ৩x পর্যায়ক্রমে দিয়ে সারাতে সক্ষম হয়েছি।

এই ধরনের ক্ষয়রোগে আমি ঐ দুটি ওষুধ বহুদিন ধরে প্রয়োগ করে বেশ ভালো ফল দেখাতে পেরেছি। এইভাবে অনেক ফুলে যাওয়া বেঢপ মাথাকে মোটামুটি একটা সঙ্গত মাপের মধ্যে আনতে পেরেছি। যক্ষ্মা বীজাণু ভয়ংকর রকমের তৎপর, খুব চটপট শরীরের গভীরে যেতে ওস্তাদ, আমি কিন্তু মাঝে মাঝে ঐ ওষুধের আশ্চর্য কাজ দেখে হতবাক হয়ে গিয়েছি।

সহজ সাধারণ অঙ্গ বা অঙ্গের অংশের রোগে আমরা সুন্দরভাবে চিকিৎসা করতে পারি। রোগের ঠিক অবস্থানটি জানা থাকলে হোমিওপ্যাথিতেই বেশ আনন্দ ও সন্তুষ্টির সঙ্গে চিকিৎসা চালাতে পারি কিংবা অর্গানোপ্যাথিতেও কাজ হয়, এসব ক্ষেত্রে সক্রিয়তার মাত্রা সরল-সাধারণ কাজেই হোমিওপন্থাই যথেষ্ট।

কিন্তু একটু এগিয়ে গেলেই বিচিত্র জটিল সব রোগে ও যন্ত্রণার মুখোমুখি হতে হয়। সেসব ক্ষেত্রেই আমাদের আলাদা করে বৈজ্ঞানিক হোমিওপ্যাথির চরম অগ্রগতির দিকে যেতে হয়, ওষুধের মাত্রার পুরো সীমাকেও সেইভাবে ঠিক করতে হয়। কোন জায়গায় কোন ওষুধ কার্যকরী, কি রকম এবং কতোটা কার্যক্ষম তা যদি কোনো চিকিৎসক নিষ্ঠা ও ধৈর্যের সঙ্গে অনুসরণ করে চলতে পারেন তাহলে

অনেক কিছু, বিরাট কিছু করতে পারবেন তিনি। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে এতোদিন পর্যন্ত যে সব পরীক্ষিত ওষুধ রোগ চিকিৎসায় ব্যবহার করা হয়েছে সেসবের সক্রিয়তার বহর অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। ফলে অনেক রোগের সক্রিয়তার সীমা ওষুধের থেমে যাওয়া অবস্থান। বিন্দুর বাইরে এতোদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে থাকে যে প্রচলিত ওষুধ দিয়ে তাকে ধরা মুস্কিল হয়। ঐ ধরনের রোগের জন্যে যদি ওষুধ ঠিক করতে হয়, তাহলে আমার মতে, প্রথমেই ওষুধ খোঁজার অভিযান করতে হবে—অর্থাৎ রোগের সক্রিয়তার সীমার সঙ্গে সমানে পাল্লা দিয়ে সক্রিয়ভাবে এগিয়ে যেতে পারে এমন ওষুকেই বাছতে হবে।

এইভাবে যক্ষ্মাগুটিকা মস্তিষ্ককে আক্রমণ করে, বেলেডোনাও তাই করে, এখানে একটা অবস্থানকে চিহ্নিত করা গেলো। কিংবা অরগ্যানোপ্যাথির মিল পাওয়া গেল, কিন্তু এটাই যথেষ্ট নয়। তীব্র যক্ষ্মায় চোখমুখ লাল হওয়া, প্রলাপ বকা, চোখের মণি বড় হওয়া এসব লক্ষণ দেখা যায়, বেলেডোনাতেও চোখমুখ লাল হওয়া, প্রলাপ বকা ইত্যাদি হয়, সুতরাং আমরা বলতে পারি যে চিকিৎসায় বেলেডোনা আর যক্ষ্মা একে অন্যের পরিপূরক কিন্তু এটা একটা সীমা পর্যন্ত সত্যি, অর্থাৎ যক্ষ্মার থামা-অবস্থান বিন্দু আর বেলেডোনার ঐ রকম অবস্থান বিন্দুতে মিল হবে না।

ধরুন একটা বিশেষ রাস্তা ধরে কুড়ি মাইল হাঁটলে আমি আমার গন্তব্যে পৌঁছব, আমার এক শক্তিশালী বন্ধু ঐ একই রাস্তায় আমার সঙ্গে হাঁটবেন, তাহলে আমি একজন সঙ্গী পাচ্ছি, কিন্তু আমার সঙ্গী এমিকাস্ মাত্র বারো মাইল যাবেন, তাহলে আরো আটমাইল আমাকে একা যেতে হবে, কিন্তু যাত্রার শেষ কয়েক মাইলেই বিপদ আছে, ফলে আমার সঙ্গে এমিকাসের প্রথম বারো মাইল হাঁটাটা আসল সময়ে কাজে লাগল না—কারণ সে আমাকে ছেড়ে যাওয়ার পরে আমার সর্বস্ব ছিনতাই হতে পারে, আমাকে মেরে ফেলতেও পারে। মাথার মধ্যে যক্ষ্মাজনিত ফুলো মাথার সঙ্গে বেলেডোনার ঠিক ঐ রকমই সম্পর্ক। বেলেডোনা হচ্ছে কুড়ি মাইল যাত্রার প্রথম বারো মাইল হাঁটার বন্ধুর মত। আমরা কুড়ি-মাইলের ওষুধ চাই, বারোমাইলের ওষুধ মোটেই যথেষ্ট নয়, বারোমাইলের ওষুধে আমরা ধ্বংস হবো।

কোনো রোগ সারানোর ব্যাপারে আংশিক লক্ষণের গুরুত্বকে তথা তার সামগ্রিকতাকে ছোট করে দেখা বা হালকা করে বলার থেকেও আমি দূরে থাকি কিন্তু ওটাও রোগ নিরাময়ের একটা উপায় সেটাও মানি তবে সামগ্রিক লক্ষণ মেলাতে গিয়ে অনেক সময় বৈজ্ঞানিক পন্থায় চিকিৎসা ছাড়া আসল কাজ হয় না। যদি ওষুধের সক্রিয়তার সীমা রোগের গতির সঙ্গে শেষ পর্যন্ত যেতে না পারে তো আপনি যতো লক্ষণকেই কাবু করুন না কেন, রোগ সারবে না।

কোনো রোগের সব লক্ষণগুলোকে মিলিয়ে ওষুধ দিলে প্রকৃত নিরাময় হবে এই সাধারণ স্বীকৃত ধারণার সঙ্গে আমি একমত হতে পারছি না। এই রকম

করে আপনি রোগ সারাতেও পারেন কিংবা রোগের উপশম ঘটাতে পারেন। এই ধরনের উপশম করনোটা অবশ্যই বিজ্ঞান সম্মত এবং কিছুটা উপকারীও কিন্তু এটা উপশম আর উপশম অবস্থাতেই থাকবে অর্থাৎ আপনি অনেক পরিশ্রম করে সব রকমের লক্ষণ মিলিয়ে পিত্তপাথুরি উপশম করলেন কিন্তু পাথুরি রয়েই গেল এই রকম আর কি।

ওষুধ দিয়ে একটা রোগকে সারাতে গেলে ওষুধটাকে রোগের গতি প্রকৃতি সঙ্গে আগাগোড়া সম্পর্ক রেখে চলতে হবে লক্ষণগুলো সে সম্পর্কের ইংগিত দিক আর নাই দিক যদি লক্ষণ রোগের থেমে যাওয়া অবস্থান বিন্দুর পরের অবস্থার ইংগিত দেয় তাহলে শুধু লক্ষণেই কাজ হবে। আমার মতে, যে চিকিৎসক লক্ষণ ছেড়ে এগিয়ে যেতে পারেন না তিনি সেই পাঠকের মতন যিনি পড়ার জন্যে শুধু শব্দের বানান করেই সন্তুষ্ট থাকেন।

কতকগুলো মারাত্মক ধরনের রোগের বেলায় আমি শুধু কয়েকটি জীবাশ্মজাত চিনেছি। সেগুলো রোগের শেষ সীমা পর্যন্ত সক্রিয় ভাবে সমানে এগিয়ে চলে। এগুলো জীবদেহের রোগের বীজাণু থেকে নিয়ে করা। জীবদেহরোগ বিষ-এর ওষুধ সম্বন্ধে লেখা বই এগ্ন পড়ে দেখুন। এই প্রসঙ্গে আমার ক্ষয়রোগ নিরাময়ের নতুন পদ্ধতি'' (**"New Cure of Consumption"**) দ্রষ্টব্য। এর সঙ্গে আমার লেখা "নেট্রাম মিউরিটিকাম ওষুধের শক্তির বিস্ফোরণ পরীক্ষা সংক্রান্ত মতবাদ'' (**"Natrun Muriaticum as test of the Doctrine of Drug Dynamization"**) গ্রন্থে। সেখানে পরিষ্কারভাবে ফলিত পরীক্ষায় দেখানো হয়েছে কেমন করে ছোট একমাত্রা 'ন্যাট্রামমিউর' অতিরিক্ত মাত্রায় লবণ খাওয়ার প্রতিক্রিয়ার প্রতিষেধক হিসেবে কাজ করে।

রোগের গতি প্রকৃতি যদি জীব জীবাণুধর্মী হয়, তাহলে ওষুধের সক্রিয়তার সীমা ঐ রকম গতিপ্রকৃতির সঙ্গে সমানে চলার মতন অর্থাৎ জীবাশ্ম-জীবাণুধর্মী হওয়া চাই।

বিজ্ঞান সম্মতভাবে হোমিওপ্যাথির আরো উন্নতি ও প্রগতির জন্যে জীবাশ্মা জীবাণুজাত ওষুধের খুব প্রতিশ্রুতি ও উজ্জ্বল সম্ভাবনা আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি, এখন অবশ্য আধখোলা দরজার ফাঁক দিয়ে যেটুকু দেখা যায় তাই দেখছি, আরো আলোর আশা নিয়ে বেঁচে আছি। এ-ব্যাপারে শুধু একটা কথা বলে রাখি—জীবাশ্মজাত যে-সব ওষুধের কথা বলা হচ্ছে তার প্রত্যেকটি আমার অনুমান মত অস্থায়ীভাবে কাজ চলতে পারে জেনেই বলেছি। অনুমান নির্ভর হলেও ওগুলো প্রায় সবই বিশুদ্ধ হোমিওমতেই নির্ণয় করা হয়েছে১ আসলে ওগুলো হোমিওপ্যাথির বেশিও নয় কমও নয় হোমিওপ্যাথির একটা বিরাট অগ্রগতির দিকেই এর লক্ষ্য। কোন কোন হ্যানিম্যানপন্থী সমালোচক আমার কিছু লেখার মূল্যায়ন প্রসঙ্গে খুব কড়া-কড়া কথা বলেছেন, তাঁরা বোধহয় আমার প্রচলিত ধারণা বিরোধী মতামত দেখে ভালো উদ্দেশ্য নিয়েই আমার মুখ বন্ধ করতে চেয়েছেন। কারো আত্মিক মতামত নিয়ে